سورة النجم

# সূরা নজম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৬২ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى ۝ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۝ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ۝ أَفَتُمٰرُوْنَهُ عَلٰى مَا يَرٰى ۝ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) উর্ধ্ব দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে ? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। (১৬) যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তার দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(যে কোন) নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। [এর জওয়াব হচ্ছে مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى-এর সাথে এই কসমের বিশেষ মিল আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র যেমন উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত আগাগোড়া পথে তার নিয়মিত গতি থেকে এদিক-সেদিক হয় না, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা) সারা জীবন পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা থেকে মুক্ত রয়েছেন। এছাড়া আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নক্ষত্র দ্বারা যেমন পথ প্রদর্শন হয়, তেমনি পথভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতার অনুপস্থিতির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) দ্বারাও পথপ্রদর্শন হয়। নক্ষত্র যখন মধ্যগগনে অবস্থান করে, তখন তার দ্বারা দিক নির্ণয় করা যায় না। তাই নক্ষত্রের সাথে অস্তমিত হওয়ার সময় যোগ করা হয়েছে। উদয়ের সময়ও নক্ষত্র দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। কিন্তু পথপ্রদর্শন প্রার্থীরা অস্তমিত হওয়ার সময়কেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মনে করে যে, এ সময়ে পথপ্রদর্শনের উপকারিতা লাভ না করলে একটু পরেই নক্ষত্র অস্তমিত হয়ে যাবে। উদয়ের সময় এই ব্যাকুলতা থাকে না। কারণ, তখন সময় প্রশস্ত থাকে। সুতরাং এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে হিদায়ত অর্জন করাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে কর এবং আগ্রহ সহকারে ধাবিত হও। এরপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে ঃ] তোমাদের (এই সার্বক্ষণিক) সংগী (অর্থাৎ পয়গম্বর, যার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম তোমাদের নখদর্পণে এবং যার কাছ থেকে তোমরা সততার প্রমাণ হাসিল করতে পার, তিনি) পথভ্রষ্ট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। ( ضلال-এর অর্থ পথ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যার غوايت-এর অর্থ বিপথকে পথ মনে করে চলতে থাকা।—(খাযেন) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি নবুয়ত ও দাওয়াতের ব্যাপারে বিপথগামী নন; বরং তিনি সত্য নবী)। এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (যেমন তোমরা افترا বলে থাক; বরং) তাঁর কথা নিছক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [অর্থ ও ভাষা উভয়ের ওহী, হলে তা কোরআন এবং শুধু অর্থের ওহী হলে তা সুন্নাহ্ নামে অভিহিত হয়। এই ওহী খুঁটিনাটি বিষয়েরও হতে পারে কিংবা কোন সামগ্রিক নীতিরও হতে পারে, যদ্দ্বারা ইজতিহাদ করা যায়। সুতরাং আয়াতে ইজতিহাদ অস্বীকার করা হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র সাথে মিথ্যা কথা সম্পর্কযুক্ত করেন—কাফিরদের এবম্বিধ ধারণা খণ্ডন করাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে] তাঁকে মহাশক্তিশালী ফেরেশতা (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই ওহী) শিক্ষা দান করে। (সে স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা শক্তিশালী হয়নি;) সহজাত শক্তিসম্পন্ন। [এক রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ) নিজের শক্তি বর্ণনা করেন ঃ আমি কওমে লূতের গোটা জনপদকে সমূলে উৎপাটিত করে আকাশের নিকট নিয়ে যাই এবং নিচে ছেড়ে দিই। (দুররে-মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এই কালাম কোন শয়তানের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছেনি যে, তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হবে; বরং ফেরেশতার মাধ্যমে পৌঁছেছে। ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসার সময় মাঝপথে শয়তান হস্তক্ষেপ

করেছে---এরূপ সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত ফেরেশতার সাথে মহাশক্তি-শালী বিশেষণটি যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, শয়তানের সাধ্য নেই যে, তার কাছে ঘেঁষে। অতঃপর ওহী সমাপ্ত হলে তা হুবহু জনসমক্ষে প্রমাণ করার ওয়াদা আল্লাহ্ নিজেই করেছেনঃ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ অতঃপর একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তি যে ফেরেশতা তা পূর্ব পরিচয়ের ভিত্তিতেই জানা যেতে পারে। পূর্ণ পরিচয় আসল আকার-আকৃতিতে দেখার উপর নির্ভরশীল। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন কি? জওয়াব এই যে, তিনি পূর্বেও দেখেছিলেন। কয়েকবার তো অন্য আকৃতিতে দেখেছেন ]। অতঃপর ( একবার এমনও হয়েছে যে ) সেই ফেরেশতা আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করল, সে ( তখন ) ঊর্ধ্বদিগন্তে ছিল। [ এক রেওয়ায়েতে এর তফসীরে পূর্বদিগন্ত বলা হয়েছে। সম্ভবত মধ্যগগনে দেখা কষ্টকর বিধায় দিগন্ত দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিম্ন দিগন্তেও কোন কিছু পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই ঊর্ধ্ব দিগন্তে মনোনীত করা হয়েছে। এর ঘটনা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার জিবরাঈলকে বললেনঃ আমি আপ-নাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবরাঈল (আ) তাঁকে হেরা গিরিগুহার নিকটে এবং তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যিয়াদ মহল্লায় দেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ওয়াদার স্থানে পৌঁছে জিবরাঈলকে পূর্ব দিগন্তে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ছয়শ বাহু প্রসারিত হয়ে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) অতঃপর বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আগমন করলেন। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।---(জালালাইন) সারকথা এই যে, ফেরেশতা প্রথমে আসল আকৃতিতে ঊর্ধ্ব দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, তখন ] সে তাঁর নিকটে এল এবং আরও নিকটে এল, ( নৈকট্যের কারণে তাদের মধ্যে ) দুই ধনুক পরিমাণ ব্যবধান রয়ে গেল কিংবা আরও কম ব্যবধান রয়ে গেল। আরবদের অভ্যাস ছিল দুই ব্যক্তি পরস্পরে চূড়ান্ত পর্যায়ের একতা ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে উভয়ই তাদের ধনুকের সূতা পরস্পরে সংযুক্ত করে দিত। এতেও কোন কোন অংশের দিক দিয়ে কিছু ব্যবধান অবশ্যই থেকে যায়। এই প্রচলিত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে নৈকট্য ও ঐক্য বোঝানো হয়েছে। এটা ছিল নিছক দৃশ্যত ঐক্যের আলামত। যদি এর সাথে অন্তরগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যও সংযুক্ত হয়, তবে أَوْ أَدْنَىٰ অর্থাৎ আরও কম ব্যবধান হতে পারে। সুতরাং أَوْ أَدْنَىٰ কথাটি বাড়ানোর ফলে ইঙ্গিত হয়েছে যে, দৃশ্যত নৈকট্য ছাড়াও রসূলুল্লাহ্ (সা) ও জিবরাঈলের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কও ছিল, যা পূর্ণ পরিচয়ের মহান ভিত্তি। মোটকথা জিবরাঈলের সান্ত্বনাদানের ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) শান্ত সুস্থির হলেন। স্বস্তি লাভ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা ( এই ফেরেশতার মাধ্যমে ) তাঁর বান্দার ( রসূলের ) প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন [ যা নির্দিষ্টভাবে জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। তখন প্রত্যাদেশ করা আসল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখিয়ে তার

পূর্ণ পরিচয় দান করাই আসল লক্ষ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পরিচয়ে অধিক সহায়ক হবে বিবেচনা করেই সম্ভবত তখন প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল। কেননা জিবরাঈল (আ) আসল আকৃতিতে থাকার কারণে এ সময়কার ওহী যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, তা অকাট্য ও সুনিশ্চিত। মানবাকৃতিতে থাকা অবস্থায় অন্য সময়ের ওহীকে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) একই রূপ দেখবেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাস আরও জোরদার হবে যে, উভয় অবস্থায় ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা একই। উদাহরণত কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও কথার ভঙ্গি জানা থাকলে যদি কোন সময় সে আকৃতি পরিবর্তন করেও কথা বলে, তবে পরিষ্কার চেনা যায়। অতঃপর এই দেখা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, আসল আকৃতিতে দেখা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অনুভূতিতে এরূপ ভ্রান্তি হওয়া বিরল নয়। সঠিক অনুভূতির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে পরিচিত জনকেও চিনতে ভুল করে। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল কি না, তা-ই প্রশ্ন। জওয়াব এই যে, এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল। কেননা, এই দেখার সময় ] রসূলের অন্তর দেখা বস্তুর ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি। ( প্রমাণ এই যে, এ জাতীয় সম্ভাবনাকে আমল দিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। ফলে সমগ্র বিশ্বের কাজ-কারবার অচল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি অনুভবকারী ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি ত্রুটিযুক্ত হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অন্তরগত ভ্রান্তির আশংকাকে আমল দেওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জ্ঞান-বুদ্ধি যে ত্রুটিযুক্ত ছিল না এবং তিনি যে মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তা সুবিদিত ও প্রত্যক্ষ। এই বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও বিপক্ষ দল বিতর্ক ও বাদানুবাদে বিরত হত না। তাই অতঃপর বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন পরিচয় ও দেখার সন্তোষজনক প্রমাণ শুনে নিলে, তখন ) তোমরা কি তাঁর ( অর্থাৎ রসূলের ) সাথে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে? ( অর্থাৎ মানুষের জানা অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকে। সর্বনাশের কথা এই যে, তোমরা এসব বিষয়েও বিরোধ কর। এভাবে তো তোমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেও হাজারো সন্দেহ থাকতে পারে। তোমরা যদি এই অমূলক ধারণা কর যে, একবার দেখেই কোন বস্তুর পরিচয় কিভাবে হতে পারে তবে এর জওয়াব এই যে, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, পরিচয়ের জন্য বারবার দেখাই জরুরী, তবে ) তিনি ( অর্থাৎ রসূল ) তাকে আরেকবার ও ( আসল আকৃতিতে ) দেখেছিলেন। ( সুতরাং তোমাদের সেই ধারণাও দূর হয়ে গেল। দুবার একই রূপ দেখার কারণে পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, সে-ই জিবরাঈল। অতঃপর আরেকবার দেখার স্থান বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে দেখেছেন ) সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে। ( বদরিকা বৃক্ষকে সিদরা বলা হয় এবং মুন্তাহার অর্থ শেষ প্রান্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ এটা সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটা বদরিকা বৃক্ষ। ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে যেসব বিধি-বিধান ও রিযিক ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো প্রথমে সিদরাতুল-মুন্তাহায় পৌঁছে, অতঃপর সেখান থেকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে আনয়ন করে। এমনিভাবে পৃথিবী থেকে যেসব আমল ও কাজকর্ম ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে সেগুলোও প্রথমে সিদরাতুল-মুন্তাহায় পৌঁছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই সিদরাতুল-মুন্তাহা ডাকঘরের অনুরূপ, যেখান থেকে চিঠিপত্রের আগমন-নির্গমন

হয়ে থাকে। অতঃপর সিদরাতুল-মুন্তাহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে )-এর ( অর্থাৎ সিদরাতুল-মুন্তাহার ) নিকটে জান্নাতুল-মাওয়া অবস্থিত। ( 'মাওয়া' শব্দের অর্থ বসবাসের জায়গা। নেক বান্দাদের বসবাসের জায়গা বিধায় একে জান্নাতুল-মাওয়া বলা হয়। মোটকথা, সিদরাতুল-মুন্তাহা একটি স্বতন্ত্র মহিমামণ্ডিত স্থানে অবস্থিত। এখন দেখার সময়কাল বর্ণনা করা হচ্ছে যে ) যখন সিদরাতুল-মুন্তাহাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা আচ্ছন্ন করছিল। [ এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা দেখতে স্বর্গের প্রজাপতির ন্যায় ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা ছিল। আরেক রেওয়া-য়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এক নজর দেখার বাসনা প্রকাশ করে ফেরেশতারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে এবং এই বৃক্ষে একত্রিত হয়।---( দুররে-মনসূর ) এতেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মানিত ছিলেন। এখানে আরও একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, বিস্ময়কর বস্তু দেখে স্বভাবতই দৃষ্টি ঘুরপাক খেয়ে যায় এবং পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় জিবরাঈলের আকৃতি কিরূপে উপলব্ধি করা যাবে? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) মোটেই হতবুদ্ধি ও বিস্মিত হন নি। সেমতে যেসব বস্তু দেখার নির্দেশ ছিল, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে ] তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি ( বরং সেগুলোকে যথাযথরূপে দেখেছেন ) এবং ( কোন কোন বস্তু দেখার নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর প্রতি ) সীমালংঘনও করেনি। [ অর্থাৎ অনুমতির পূর্বে দেখেন নি। এটা তাঁর চূড়ান্ত দৃঢ়তার প্রমাণ। আশ্চর্য বস্তু দেখার বেলায় মানুষ সাধারণত এই দ্বিবিধ কাণ্ড করে থাকে--যেসব বস্তু দেখতে বলা হয়, সেগুলো দেখে না এবং যেগুলো দেখতে বলা হয় না, সেগুলোর দিকে তাকাতে থাকে। ফলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃঢ়তা শক্তি বর্ণনা করা হচ্ছে যে ] নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার ( কুদরতের ) মহান অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন। ( কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। মি'রাযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেথায় পয়গম্বর-গণকে দেখেছেন, আত্মাসমূহকে দেখেছেন এবং জান্নাত-দোযখ ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তিনি চূড়ান্ত দৃঢ়চেতা। সুতরাং অভিভূত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মোট কথা, জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের পরিচয় সম্পর্কিত যেসব সন্দেহ ছিল, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে রিসালত প্রমাণিত ও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এ স্থলে এটাই ছিল উদ্দেশ্য )।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য ঃ** সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় ঘোষণা করেন।---( কুরতুবী ) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) তিলাওয়াতের সিজদা করেন। মুসলমান ও কাফির সবাই এই সিজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফির ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সিজদায় আভূমি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার

নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল ঃ ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। —(ইবনে কাসীর)

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى—নক্ষত্রমাত্রকেই نَجْم বলা হয় এবং এর বহুবচন نُجُوم—

কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর 'সুরাইয়া' অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। ফাররা ও হযরত হাসান বসরী (র) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।---(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই অবলম্বন করা হয়েছে। هَوٰى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাতে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমেও আল্লাহ্র পথের দিকে হিদায়ত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى—এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে।

এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, তাই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যান নি এবং বিপথগামীও হন নি।

**রসূলের পরিবর্তে তোমাদের সংগী বলার রহস্য ঃ** এ স্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নাম অথবা 'নবী' শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'তোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দ কাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেন নি, তিনি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى —অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ্‌র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বুখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। দুই. যার কেবল অর্থ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ্। এরপর হাদীসে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলিম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ্‌র কাছে কেবল ক্ষমার্হই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার-ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সব কথাই যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করে-ছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশংকা থাকে।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى —এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকতে পারে না।

**এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদঃ** এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। এক. আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তফসীরের

সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্র দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, اسْتَوٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মাযহারী এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। দুই. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'মহাশক্তিশালী' ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব হাদীসের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

عن الشعبی عن مسروق قال کنت عند عائشة فقلت الیس الله یقول ولقد راه بالافق المبین - ولقد راه نزلة اخری فقالت انا اول هذه الامة سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عنها فقال انما ذاک جبرائیل لم یره فی صورته التی خلق علیها الا مرتین راه منهبطا من السماء الی الارض سادا عظم خلقه ما بین السماء والارض -

শা'বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন---তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্কে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন ঃ আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ)। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।---( ইবনে কাসীর )

সহীহ্ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (র) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা)-র ভাষা এরূপ ঃ

انا اول من سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك فقال لا انما رايت جبرائيل منهبطا ـ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বললেন, না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।---( ফতহুল-বারী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ )

সহীহ্ বুখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

তিনি জওয়াবে বললেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে ছয়শ বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (র) আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

**ইবনে কাসীরের বক্তব্য ঃ** ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ সূরা নজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'দেখা' ও 'নিকটবর্তী হওয়া' বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবূ যর গিফারী, আবূ হুরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন ঃ

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রসূলুল্লাহ্ (সা) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়ায দিতেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়ায শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াযের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আ) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন।

এরপর তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।---(ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল--কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى——আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে মি'রাযের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবূ হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى——مرة শব্দের অর্থ শক্তি। জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্য এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوٰى এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে 'ঊর্ধ্ব' সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে ঊর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى——دنى শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং تَدَلّٰى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়। এই ব্যবধান

আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। قاب قوسين দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা এক গজ। এরপর أَوْ أَدْنَىٰ বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণ প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল না; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌঁছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশংকাও বাতিল হয়ে যায়।

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ—এখানে أَوْحَىٰ ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং عبده-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-কে শিক্ষক হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সন্নিকটে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

**একটি শিক্ষাগত খটকা ও তার জওয়াব :** এখানে বাহ্যত একটি খট্‌কা দেখা দেয় যে, উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দ্বারা অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ আয়াতে সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বোঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং انتشار ضمائر তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততার কারণ।

মওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এর জওয়াবে বলেন : এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কোন ত্রুটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিপ্ততাও নেই; বরং সত্য এই যে, সূরার শুরুতে إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ বলে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল, তারই ধারাবাহিক বর্ণনা এভাবে করা হয়েছে যে, ওহী প্রেরণকারী স্পষ্টত আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নয়। কিন্তু এই ওহী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে জিবরাঈল (আ) ছিলেন মাধ্যম। কয়েকটি আয়াতে এই মাধ্যমের পূর্ণ সত্যায়ন করার পর পুনরায় اوحى الى عبده বলা হয়েছে। সুতরাং এটা প্রথম বাক্যেরই পরিশিষ্ট। একে সর্বনামের বিক্ষিপ্ততা বলা

যায় না। কারণ, اوحى এবং عبده—এসবের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বোঝানো ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই যে নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। مَا اَوْحٰى অর্থাৎ যা ওহী করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পষ্ট রেখে এর মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদ্দাসসিরের শুরু ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাদেশকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল (আ)। আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চমর্যাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমের ন্যায়ানুগ সত্যায়ন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى — فؤاد শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كذب শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ দেখা বস্তুকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। مَا رَاٰى শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী رَاٰى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তর্চক্ষু দ্বারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও 'কল্‌ব' (অন্তকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ আয়াতে কল্‌ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাকের لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

نَزْلَةً اُخْرٰى—وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى—এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুন্তাহা' বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রাযের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ্' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। 'মুন্তাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুবী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে 'মুন্তাহা' বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুন্তাহায়' নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى—مَاْوٰى শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَاْوٰى বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

**জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান ঃ** এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে

যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পেঁৗছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আরিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তরাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى — অর্থাৎ যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণনির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রাসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى — زَاغَ শব্দটি زَيْغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপথগামী হওয়া। طَغٰى শব্দটি طُغْيَان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি। এতে এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টি বিভ্রম করে ; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—এক. দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। مَا زَاغَ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয় ; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দুই. দৃষ্টি উদ্দিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وَمَا طَغٰى বলা হয়েছে।

যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাঁদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) হলেন ওহীর

মাধ্যম। রসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহ-মুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তাঁরা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টি কোন ভুল করেনি ; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

**উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে আরও একটি বক্তব্য ঃ** সূরা নজমের আয়াত-সমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি ও শিক্ষাগত খট্‌কা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 'মুশকিলাতুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা আন-ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এসব আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরোক্ত বিভিন্ন রূপ উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। এই তফসীর দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

এক. রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এই দেখা সপ্তম আকাশে 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে হয়েছে। বলা বাহুল্য, মি'রাযের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ্ (সা) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নির্দিষ্টরূপে জানা যায়।

قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينا انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر الى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع -

রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম। আমি উপরের দিকে দৃষ্টি তুলতেই দেখি যে, ফেরেশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত একটি কুরসীতে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াত وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম

ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মি'রাযের পূর্বে মক্কায় এবং দ্বিতীয় ঘটনা মি'রাযের রাত্রিতে সপ্তম আকাশে ঘটে।

দুই. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ ( কমপক্ষে وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى থেকে لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত ) মি'রাযের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা সাইয়্যেদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ

কোরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। এক. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে তখন দেখা, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর বিরতিকালে মক্কায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মি'রাযের পূর্ববর্তী ঘটনা।

দুই. মি'রাযের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দ্বিতীয়বার দেখার চাইতে আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নিদর্শনাবলী দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্র যিয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জওয়াব দেওয়াই সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মতকে যা কিছু বলেন, এতে কোন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তির আশংকা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কিছু বলেন না ; বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অতঃপর এই ওহী যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি গুরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌঁছান, তাই জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মক্কার কাফিররা ইসরাফীল ও মিকাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোট কথা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্তু ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ——এ পর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রিসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তফসীরবিদের অনুরূপ এগুলোকে যদি আল্লাহ্ তা'আলার গুণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত شَدِيْدُ الْقُوٰى — ذُوْ مِرَّةٍ — دَنٰى فَتَدَلّٰى এবং فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ইত্যাদি বিশেষণকে

আর্থিক হেরফেরসহ তো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ)-কে দেখার সাথে সম্পৃক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দ্বাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى থেকে مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-কে দ্বিতীয়বার আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনার দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহ্র দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়। সমর্থনে সহীহ্ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি রয়েছে। তাই مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى আয়াতের তফসীর এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) চর্মচক্ষে যা দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোন ভুল করেনি। এখানে 'যা কিছু দেখেছেন'—এই ব্যাপক ভাষার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখাও শামিল আছে এবং মি'রাযের রাত্রিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার ও যিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দ্বারাও এর সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى—এতে কাফির-দেরকে বলা হয়েছে, পয়গম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়—চাক্ষুষ সত্য। আয়াতে مَا يَرٰى-এর পরিবর্তে مَا قَدْ رَاٰى বলা হয়নি। এতে মি'রাজের রাত্রিতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহ্কে দেখা—এই উভয় দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। আল্লাহ্কে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকট্য স্বভাবতই জরুরী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রাত্রিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

—আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নৈকট্যের স্থান 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আল্লাহ্র যিয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয় ঃ

واتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة خررت لها ساجدا وهذه الضبابة فى الظلل من الغمام التى يأتى فيها الله ويتجلى -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি 'সিদরাতুল-মুন্তাহার' নিকটে পৌঁছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বস্তু আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সিজদানত হয়ে গেলাম। কোরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বস্তুতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন।

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াত مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى—এর অর্থেও উভয় দেখা শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষে হয়েছে। সার কথা এই যে, মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ)-কে দেখা ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা—উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তফসীরে আল্লাহ্‌কে দেখার কথা বলেছেন এবং কোরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

**আল্লাহ্‌র দীদারঃ** সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলেঃ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ —অর্থাৎ পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। ইমাম মালিক (র) বলেনঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আয়ায (র) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপঃ واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্দ্বারা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মি'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্‌র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশযুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর

মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যদ্দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেন ঃ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয় ; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ
وَلَهُ الْأُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ
سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
رَبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ
وَالْأُولٰى ﴿٢٥﴾ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا
لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

(১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? (২১) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য ?

**(২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তা-ই কি পায় ? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্র হাতে। (২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতা-দেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

( মুশরিকগণ! প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রসূল ওহীর অনুসরণে কথাবার্তা বলেন এবং তিনি এই ওহীর আলোকে তওহীদের নির্দেশ দেন, যা যুক্তি প্রমাণেও সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এর পরও প্রতিমা পূজা কর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ) তোমরা ( কখনও এসব প্রতিমা উদাহ-রণত ) লাত ও ওয্যা এবং তৃতীয় আরেক মানাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ? ( যাতে তোমরা জানতে পারতে যে, তারা পূজার যোগ্য কিনা ? তওহীদ সম্পর্কে আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, তোমরা ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করে উপাস্য বলে থাক। জিজ্ঞাস্য এই যে, ) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য ? ( অর্থাৎ যে কন্যাদেরকে তোমরা লজ্জা ও ঘৃণাযোগ্য মনে কর, তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধযুক্ত কর )। এটা তো খুবই অসংগত বন্টন। ( ভাল জিনিস তোমাদের ভাগে এবং মন্দ জিনিস আল্লাহ্র ভাগে! এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করাও অসংগত )। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, ( অর্থাৎ উপাস্যরূপে এগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বরং নামই সার ) যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এদের ( উপাস্য হওয়ার ) সমর্থনে আল্লাহ্ কোন ( যুক্তিগত ও ইতিহাসগত ) দলীল প্রেরণ করেন নি ; ( বরং ) তারা ( উপাস্য হওয়ার এই বিশ্বাসে ) কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ( যে প্রবৃত্তি অনুমান থেকে উদ্ভূত হয় )। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ( সত্যভাষী ও ওহীর অনুসারী রসূলের মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের ) পথনির্দেশ এসে গেছে। ( অর্থাৎ তাদের দাবীর সমর্থনে তো কোন দলীল নেই, কিন্তু রসূলের মাধ্যমে দলীল শুনেও তা মানে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাস্য হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল প্রসঙ্গে এই আলো-চনা হল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমরা প্রতিমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপাস্য মনে কর যে, তারা আল্লাহ্র কাছে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যও নিরেট ধোঁকা ও বাতিল। চিন্তা কর ) মানুষ যা চায়, তাই কি পায় ? না। কেননা, প্রত্যেক আশা আল্লাহ্র হাতে ---পরকালেরও এবং ইহকালেরও। ( সুতরাং তিনি যে আশাকে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কোরআনের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই বাতিল আশা পূর্ণ করতে চাইবেন না। কাজেই প্রতিমারা দুনিয়াতে কাফিরদের অভাব-অনটনের ব্যাপারে

সুপারিশ করবে না এবং পরকালে আযাব থেকে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করবে না। তাই নিশ্চিতরূপেই তাদের আশা পূর্ণ হবে না। বেচারী প্রতিমা কি সুপারিশ করবে, তাদের মধ্যে তো সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। যারা এই দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তাদের সুপারিশও কার্যকর হবে না। সেমতে) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, (এতে বোধ হয় উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু এই উচ্চমর্যাদা সত্ত্বেও) তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না (বরং সুপারিশই করতে পারে না,) কিন্তু যখন আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ) পছন্দ করেন। (মানুষ চাপে পড়ে এবং উপযোগিতাবশত পছন্দ ছাড়াও অনুমতি দেয়; কিন্তু আল্লাহ্র ব্যাপারে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই أَوْ يَرْضَىٰ বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র সন্তান সাব্যস্ত করা কুফর। সেমতে) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণে কাফির) তারাই ফেরেশতাগণকে (আল্লাহ্র কন্যা তথা) নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে। (তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'পরকালের অবিশ্বাস' উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, এসব পথভ্রষ্টতা পরকালের প্রতি উদাসীনতা থেকেই উদ্ভূত। নতুবা পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীয় মুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করে। ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা যখন কুফর হল, তখন প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা যে কুফর তা আরও উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। তাই এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করা বাতিল) অথচ এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তারা কেবল ভিত্তিহীন ধারণার উপর চলে। নিশ্চয় সত্যের ব্যাপারে (অর্থাৎ সত্য প্রমাণে) ভিত্তিহীন ধারণা মোটেও ফলপ্রসূ নয়।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ্র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহ্র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওয্যা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্রের, ওয্যা কোরায়েশ গোত্রের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থান স্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সা) এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।---(কুরতুবী)

قِسْمَةٌ ضِيزٰى—ضِيزٰى শব্দটি ضوز থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) قسمة ضيزى এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

**ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ** اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমা পূজার কারণ ছিল। দুই. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। 'একীন' তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে 'যন' তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়; বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে 'একিনিয়্যাত' তথা দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'যন্নীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব---এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খট্‌কা নেই।

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ

الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ

بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

(২৯) অতএব, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্‌ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী ?

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى আয়াতদ্বয় এবং إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ( থেকে জানা গেল যে, মুশরিকরা হঠকারী। কোরআন ও হিদায়ত নাযিল হওয়া সত্ত্বেও তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। হঠকারীর কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা যায় না অতএব ) যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তার তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে বলেই পরকালে বিশ্বাস করে না, যা لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ থেকে উপরে জানা গেছে)। তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই (অর্থাৎ পার্থিব জীবন পর্যন্তই। অতএব, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করুন)। আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত। (এ থেকে তাঁর জ্ঞান প্রমাণিত হয়েছে। এখন কুদরত সপ্রমাণ করা হচ্ছে ঃ) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। (যখন জ্ঞান ও কুদরতে আল্লাহ্‌ কামিল এবং তাঁর আইন ও বিধানাবলী পালনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার-পথভ্রষ্ট ও সুপথপ্রাপ্ত, তখন) পরিণাম এই যে, তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের (মন্দ) কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন এবং সৎকর্মীদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন। (কাজেই তাদের ব্যাপার তাঁরই কাছে সোপর্দ করুন। অতঃপর সৎকর্মীদের পরিচয় দান করা হচ্ছে ঃ) যারা বড় বড় গোনাহ্‌ এবং (বিশেষ করে) অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাট গোনাহ্‌ করলেও (এখানে যে সৎ কর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ছোটখাট গোনাহ্‌ দ্বারা ত্রুটিযুক্ত হয় না। আয়াতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, আয়াতে যে সৎকর্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য বড় বড় গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকা তো শর্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে ছোটখাট গোনাহ্‌ হয়ে যাওয়া এর পরিপন্থী নয়। তবে ছোটখাট গোনাহ্‌ও কচিৎ হয়ে যাওয়া শর্ত

—অভ্যাস না হওয়া চাই এবং বারবার না করা চাই। বারবার করলে ছোটখাট গোনাহ্ও বড় গোনাহ্ হয়ে যায়। ব্যতিক্রমের অর্থ এরূপ নয় যে, ছোটখাট গোনাহ্ করার অনুমতি আছে। বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার যে শর্ত রয়েছে, এর অর্থ এরূপ নয় যে, বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপর সৎকর্মীদের সৎকর্মের উত্তম প্রতিদান পাওয়া নির্ভরশীল। কেননা, যে বড় বড় গোনাহ্ করে, সেও কোন সৎ কর্ম করলে তার প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ সুতরাং এই শর্ত প্রতিদান দেওয়ার দিক দিয়ে নয় ; বরং তাকে সৎকর্মী ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র উপাধি দান করার দিক দিয়ে। উপরে মন্দ কর্মীদেরকে শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে গোনাহ্গারদেরকে নিরাশ করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা ঈমান ও তওবা করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। এছাড়া সৎকর্মীদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদার কারণে তাদের আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হওয়ার ধারণাও আশংকা রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে উভয় প্রকার ধারণা খণ্ডন করে বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। অতএব, যারা গোনাহ্-গার তারা যেন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সাহস হারিয়ে না ফেলে। তিনি ইচ্ছা করলে কুফর ও শিরক ব্যতীত সব গোনাহ্ কৃপাবশতই মাফ করে দেন। অতএব, ক্ষতিপূরণ করলে কেন মাফ করবেন না। এমনিভাবে সৎকর্মীরা যেন আত্মম্ভরী না হয়ে উঠে। কেননা, মাঝে মাঝে সৎ কর্মে অপ্রকাশ্য ত্রুটি মিলিত হয়ে যায়। ফলে সৎ কর্ম গ্রহণযোগ্য থাকে না। সৎ কর্ম যখন গ্রহণীয় হবে না, তখন সৎকর্মী আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তোমাদের কোন অবস্থা তোমরা নিজে জানবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানবেন। শুরু থেকেই এরূপ হয়ে আসছে। সেমতে) তিনি তোমাদের সম্পর্কে (ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে তখন থেকে) ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তার মাধ্যমে তোমরাও মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। (এই উভয় অবস্থায় তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানতে না ; কিন্তু আমি জানতাম। এমনিভাবে এখনও তোমাদের নিজে-দের ব্যাপারে অনবহিত হওয়া এবং আমার অবহিত ও ওয়াকিফহাল হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়)। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। (কেননা) তিনি ভাল জানেন কে তাকওয়া অবলম্বনকারী! (অর্থাৎ তিনি জানেন যে, অমুক তাকওয়া অবলম্বনকারী নয়, যদিও দৃশ্যত উভয়েই তাকওয়া অবলম্বন করে)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ অর্থাৎ যারা আমার স্মরণে বিমুখ এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই

কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দৌড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয় ইংরেজী শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সা)-এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলকে এহেন অবস্থা-সম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহি মিনহা।

الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لمم শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

لَمَم শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। এক. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নিসার আয়াতে একে اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ বলা হয়েছে। سيئات এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন। দুই. এর অর্থ সেসব গোনাহ্, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন সৎ লোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আল-ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই:

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কার্য ও কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায় অথবা গোনাহ্ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে ও গোনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারে? যা গোনাহ্ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ্ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে لمم এর তফসীরে এমন গোনাহ্‌র কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংজ্ঞা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ

اَجِنَّةٌ — শব্দটি جَنِيْن -এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলে। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সৎ কাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎ কাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহিযগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালমন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى — অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌ভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আল্লাহ্‌ভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমা (রা)-র পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা', যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ আয়াত

তিলাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন ঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে কর ঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আল্লাহ্ভীরু। সে আল্লাহ্র কাছেও পাক-পবিত্র কিনা আমি জানি না।

---

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۝٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ۝٣٤ أَعِندَهُ عِلْمُ
الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ۝٣٥ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝٣٦ وَإِبْرَاهِيمَ
الَّذِي وَفَّىٰ ۝٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝٣٨ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ
إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝٤١
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝٤٢ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝٤٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا ۝٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٤٥ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا
تُمْنَىٰ ۝٤٦ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝٤٧ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝٤٨ وَ
أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۝٤٩ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝٥٠ وَثَمُودَا فَمَا
أَبْقَىٰ ۝٥١ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝٥٢
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝٥٣ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۝٥٤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝٥٥
هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ۝٥٦ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۝٥٧ لَيْسَ لَهَا مِن
دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝٥٨ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝٥٩ وَتَضْحَكُونَ
وَلَا تَبْكُونَ ۝٦٠ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ۝٦١ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ۝٦٢

সেজদা

---

(৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি

জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ্ নিজে বহন করবে না (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে (৪০) তার কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল---পুরুষ ও নারী (৪৬) একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। (৫১) এবং সামূদকেও অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ক-কারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসছ--ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব, আল্লাহ্কে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর।

---

**শানে-নুযূল** ঃ দুর্‌রে মনসূরে ইবনে জরীর (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রূহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম 'ওলীদ ইবনে মুগীরা' লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(সৎকর্মীদের পরিচয় শুনলেন, এখন) আপনি কি তাকেও দেখেছেন, যে (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সামান্যই দেয়, অতঃপর বন্ধ করে দেয়? (অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে অর্থকড়ি দেওয়ার ওয়াদা নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য করে, তাকেও পুরোপুরি দেয় না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এরূপ ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য কিছুই ব্যয় করবে না। এর সারমর্ম এই যে, সে কৃপণ) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে তা দেখে? যার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে যে, অমুক ব্যক্তি আমার পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। তার কাছে কি সেই বিষয়বস্তু পৌঁছেনি, যা আছে মূসা (আ)-র কিতাবসমূহে [তওরাত ছাড়াও মূসা (আ)-র দশটি সহীফা ছিল] এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে, সে বিধানাবলী পূর্ণরূপে পালন করেছিল? (সেই বিষয়বস্তু) এই যে, কেউ কারও গোনাহ্

(এভাবে) বহন করবে না (যে, গোনাহ্‌কারী মুক্ত হয়ে যায়। কাজেই সে কিরূপে বুঝল যে, এই ব্যক্তি তার গোনাহ্ বহন করবে?) এবং মানুষ (ঈমানের ব্যাপারে) তাই পায়, যা সে করে (অর্থাৎ অন্যের ঈমান দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। সুতরাং তিরস্কার-কারী ব্যক্তির ঈমান থাকলেও তা তার উপকারে আসত না। তার ঈমান না থাকলে তো কথাই নেই)। এবং মানুষের কর্ম শীঘ্রই দেখা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের সাফল্যের চেষ্টা থেকে কিভাবে গাফিল হয়ে গেল?) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে সবাইকে পৌঁছতে হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরূপে নিশ্চিত হয়ে গেল?) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল (গর্ভাশয়ে) স্খলিত একবিন্দু বীর্য থেকে সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ সব কাজকর্মের তিনিই মালিক—অন্য কেউ নয়। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরূপে বুঝে নিল যে, কিয়ামতের দিন তাকে আযাব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা অন্যের করায়ত্ত থাকবে)? এবং পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই। (অর্থাৎ কারও দায়িত্বের ন্যায় এটা অবশ্যই হবে। অতএব, কিয়ামত হবে না, এটা যেন এই ব্যক্তির নিশ্চিত হওয়ার কারণ না হয়)। এবং তিনিই ধনবান করেন এবং সম্পদ দান করেন। এবং তিনিই শিরা-নক্ষত্রের মালিক। (মূর্খতা যুগে কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাজকর্মের এসব কাজকর্ম ও বিষয়সমূহের মালিকও তিনিই। পূর্বোক্ত কাজকর্ম মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এবং এসব কাজকর্ম মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। সম্পদ ও নক্ষত্র উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তোমরা যাকে সাহায্যকারী মনে কর, তার মালিকও আমিই। অতএব, কিয়ামতে অন্যরা এসব কাজকর্মের অধিকারী হবে কিরূপে?) এবং তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকেও, অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। তাদের পূর্বে কওমে নূহকে (ধ্বংস করেছেন)। তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। কারণ, সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতের পরও তারা পথে আসেনি এবং (লূতের) জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে তিনিই নিক্ষেপ করেছেন, অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়, যা আচ্ছন্ন করার। (অর্থাৎ উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হতে থাকে। অতএব, এই ব্যক্তি যদি এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করত, তবে কুফরের আযাবকে ভয় করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ! তোমাকে এমন বিষয়বস্তু জানানো হল, যা হিদায়ত হওয়ার কারণে এক একটি নিয়ামত)। অতএব, তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (এবং এসব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে উপকৃত হবে না?) তিনিও (অর্থাৎ এই পয়গম্বরও) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে একজন সতর্ককারী। (তাঁকে মেনে নাও। কারণ) দ্রুত আগমনকারী বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে। (যখন তা আসবে, তখন) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে হটাতে পারবে না। (সুতরাং কারও ভরসায় নিশ্চিন্তে বসে থাকার অবকাশ নেই। অতএব, এমন ভয়াবহ কথাবার্তা শুনেও) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং (পরিহাসছলে) হাসছ—(আযাবের ভয়ে) ক্রন্দন করছ না? তোমরা অহংকার করছ। (এ থেকে বিরত হও এবং পয়গম্বরের

শিক্ষা অনুযায়ী) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং (শিরকবিহীন) ইবাদত কর, (যাতে তোমরা মুক্তি পাও)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى—تولى-এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

أَكْدَى—শব্দটি كدية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে اكدى-এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى—শানে-নুযূলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে-নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ—অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তার বিকল্প দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

চিন্তা করলে দেখা যায়, কোরআনের এই বাণীর সত্যতা কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোন শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হত, তবে ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ انفق يا بلال و لا تخش من ذى العرش اقلالا বিলাল, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশংকা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন।—(ইবনে কাসীর)

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى—এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وفى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

**ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ** উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وفى শব্দের এই তফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وفى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ড-সহ আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রিসা-লতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত আবূ ওসামা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তিলাওয়াত করে তাঁকে বললেন ঃ তুমি জান এর মতলব কি? আবূ ওসামা (রা) আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ অর্থ এই যে, وفى عمل يومه باربع ركعات فى اول النهار অর্থাৎ তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে কাসীর)

তিরমিযীতে আবূ যর (রা) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره -

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাক'আত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে اَلَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন:

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ - (ইবনে কাসীর)—

**মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষাঃ** কোরআন পাক পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দু'টি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এইঃ

اَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

وزر — শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ— অর্থাৎ কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

**একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে নাঃ** এই আয়াতের শানে-নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে

ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র দরবারে একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আযাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয় অথবা যে ওয়ারিস-দেরকে ওসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়।—(মাযহারী) এমতাবস্থায় তার আযাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى — এর সারমর্ম এই যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবূল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মু'মিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরে কোন আইনগত খট্‌কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও যাকাতের প্রশ্নে বেশীর বেশী এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের যাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে যাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

**'ইসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌঁছানো ঃ** উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফরয ঈমান, ফরয নামায ও ফরয রোযা আদায় করে তাকে ফরয থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরী হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও সওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না ; বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলিমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার।—(ইবনে কাসীর)

কেবল কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরকে দান করা ও পৌঁছানো জায়েয কি না, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েয নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব যেমন অপরকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কোরআন তিলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের সওয়াব অপরকে পৌঁছানো

জায়েয। এরূপ সওয়াব পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলেনঃ অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মু'মিন ব্যক্তি অপরের সৎ কর্মের সওয়াব পায়। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى — অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ انما الاعمال بالنيات অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার অনুমতিও নেই; যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর; তাঁর সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى — অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। কবি চমৎকার বলেছেনঃ

بگوش گل چه سخن گفتۂ کے خندان ست

بعندلیب چه فرموده که نالان ست

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى — غناء শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اغناء শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اقنى শব্দটি قنية থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাব মুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى — شعرى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালকর্তা তিনি।

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَ ِۨالْاُوْلٰى وَثَمُوْدَا۟ فَمَآ اَبْقٰى — 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হূদ (আ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝন্‌ঝা বায়ুর আযাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আযাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।—(মাযহারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ্ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবা-ধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আযাব আসে। ফলে তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى — مؤتفكه-এর শাব্দিক অর্থ সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ জিবরাঈল (আ) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى — অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হল।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى — تمر শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে

যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى—هٰذَا শব্দ দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা) অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কোরআনও পূর্ববর্তী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখান।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ—অর্থাৎ নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ—هٰذَا الْحَدِيْثِ বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন স্বয়ং একটি মো'জেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ্ ও ত্রুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ—سمود-এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا—অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা নজম পাঠ করে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মু'মিন ও মুশরিক সিজদা করল,

একজন কোরায়েশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে সূরা নজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্তু তিনি সিজদা করেন নি। এই হাদীসদৃষ্টে জরুরী হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর ওযু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থী অন্য কোন ওযর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।